# ATMADEEP

A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 94-100
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.013**

# নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ভুবন: প্রতিবাদ ও নির্বাসিতের প্রতিবেদন

**অমিত দেব,** *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত*
E mail: debamit944@gamil.com

Received: 03.09.2024; Accepted: 29.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## ABSTRACT

*In the history of Bengali short stories, Narayan Gangopadhyay is a well-known name today. He is a distinctive artist of Bengali fiction. After the literary phase centered around magazines like Kallol and Kalikalam, he was among the few emerging storytellers who gradually enriched Bengali short stories. During and after World War II, powerful writers like Subodh Ghosh, Santosh Kumar Ghosh, Nabendu Ghosh, Narendra Nath Mitra, and Narayan Gangopadhyay wrote stories that reflected the struggles of real life and the perceptions of truth, which became vividly apparent through their narratives.*

*Narayan Gangopadhyay is a key figure in the transformation of Bengali stories. From war and famine to independence, partition, communalism, and the refugee crisis, he claimed innovation in the remarkable structure and extraordinary language of contemporary storytelling. His works include nearly 14 collections of short stories. The entire decade of the 1940s left deep scars on the map of Bengal and India. The August Movement, the Quit India Movement, Japanese bombings, black markets, control, famine, anti-fascist movements, student-worker strikes, communal riots, fragmented independence, partition, and the refugee influx highlighted the social and political context of that decade.*

*Poets and writers experienced the terrifying reality of famine first-hand. They felt the unavoidable presence of death and destruction. In the context of war, the shattered lives depicted lacked the romanticism of Sharatchandra, the bohemianism of Kallol, and the nature fascination of Bibhutibhushan. It was in this changed backdrop that Narendra Nath Mitra, Samresh Basu, Narayan Gangopadhyay, Ramapad Chowdhury, and Bimal Kar emerged, among others. A confluence of thought occurred among all of them. In Narayan Gangopadhyay's short stories, the reality of that time vividly emerges. In our discussion, we will attempt to highlight various socio-economic themes from the 1940s that appear in his stories.*

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজ এক সুপরিচিত নাম। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র শিল্পী। কল্লোল, কালিকলম, ইত্যাদি পত্রিকা কেন্দ্রিক সাহিত্য পর্বের পর বাংলা ছোটগল্প যে কয়েকজন নবীন গল্পকারের রচনার দ্বারা ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ও পরবর্তী সময়ে গল্প লিখেছেন সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখকরা। বাস্তব জীবনের কঠিন সংগ্রাম ও সত্যতার উপলব্দি সমূহ তাঁদের গল্প মাধ্যমে কালের দর্পণে আরো তীব্র ভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা গল্পের পালাবদলের এক অন্যতম কারিগর। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, থেকে শুরু করে স্বাধীনতা, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা ও উদবাস্তু সমস্যার নানা কালচিত্র সমকালীন  গল্পের অনবদ্য আঙ্গিক ও অসাধারণ ভাষার নির্মাণেও অভিনবত্বের দাবিদার তিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩২৫ বঙ্গাব্দে, ইং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ বাংলাদেশের বালিয়াডিঙ্গি, দিনাজপুরে। আদি নিবাস বরিশালের নলচিরায়। মৃত্যু ২২শে কার্ত্তিক, ১৯৭৭ বঙ্গাব্দে, ইং ৬ই নভেম্বর ১৯৭০। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল রাজনীতি সচেতনতা, প্রতিবাদী ভাবনা। দাদারাই ছিলেন এর মূল অনুপ্রেরণা। বাজেয়াপ্ত বইপত্র সংগ্রহ করে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিশোর লেখক। এর জন্য তাঁদের বাড়ী সার্চ করা হয়েছিল এমনকি থানায় নিয়ে গিয়ে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে মারধোরও করা হয়েছিল। মাতৃহীন কিশোর ছেলেটিকে পুলিশ প্রচণ্ড মারলেও সেদিন শুধুমাত্র ঠাকুমাই কেঁদেছিলেন, বাবা কিছু বলেননি। দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হলে যে অনেক কঠিন ব্রত আর ত্যাগের শিক্ষাকে বরণ  করে নিতে হয় তা বাবা বুঝেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর মনের শ্রদ্ধাকে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন লেখক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী থেকে তাঁর গল্পের প্রায় ১৪ টি সংকলন পাওয়া যায়। সেগুলির কয়েকটির নাম হলো ‘বীতংস’ (১৯৪৫), ‘ভাঙাবন্দর’(১৯৪৫), ‘ভোগবতী’(১৯৪৫), ‘কালাবাদর’(১৯৪৮), ‘দুঃশাসন’(১৯৫২), পভৃতি। শতাদিক জনপ্রিয় গল্পের স্রষ্টা তিনি। ‘বীতংস’ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হলো-‘টোপ’, ‘হাড়’, ‘তৃণ’, ‘সৈনিক’, ‘জান্তব’, ‘কালোজল’ , ‘রেকর্ড’ ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হলো- ‘গল্পসংগ্রহ’, (১৯৫৭), ‘শ্রেষ্ট গ্লপ’(১৩৫৬), ‘দুঃশাসন’(১৩৬১), ‘শ্বেতকমল’(১৩৬১), ‘শিলাবতী’(১৯৬৪), ‘ভাটিয়ালি’(১৩৬৪), ‘রুপমতী”(১৯৫৯)।

গোটা  চল্লিশের দশক বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানচিত্রকে করে তুলেছিল ক্ষতবিক্ষত। আগস্ট আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জাপানী বোমার আক্রমণ, কালোবাজার, কন্ট্রোল, মন্বন্তর, ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলন, ছাত্র-শ্রমিক ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, বাস্তহারা স্রোত গোটা দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। মন্বন্তরের ভয়ংকর রূপকে বিভীষিকাময় দিনগুলিকে নিজের চোখে উপলব্ধি করেছিলেন কবি ও সাহিত্যকেরা। তারা অনুভব করেছিলেন অনিবার্য মৃত্যু ও ধ্বংসের রূপকে। সুকান্তর মতো কবি নিজের জীবনের সঙ্গে দুর্ভিক্ষকে অন্বিত করে নিতে পেরেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন-

“আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।”[১]

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে ভাঙাচোরা জীবনের সাক্ষাৎ আমরা পাই, সেখানে নেই শরৎচন্দ্রের রোমান্টিকতা, নেই কল্লোলীয় বোহেমিয়ানিজম, নেই বিভূতিভূষণের প্রকৃতি মুগ্ধতা। সেই পরিবর্তিত

পটভূমিতেই এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, প্রমুখ। এঁদের সকলের মধ্যেই ঘটেছিল ভাবনার মেলবন্ধন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন ঘটনার প্রতক্ষ্য দ্রষ্টা ছিলেন। লেখক দেখেছেন লঙ্গরখানার পথে ক্ষুধাকাতর অভুক্ত মানুষের মিছিল; দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত অসহায়দের মুখচ্ছবি ব্যথিত করে তুলেছে হৃদয়। স্বদেশ ও সমাজকে দেখার নিদারুণ অভিজ্ঞতায় বেড়ে উঠেছিল মন ও মনন। তাঁর ছিল স্থির অকম্পিত বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মানুষের প্রতি। এই স্থির অকম্পিত বিশ্বাসই তাঁকে দিয়েছিল প্রেরণা, শুনিয়েছিল নতুন দিনের গান। তাঁর ভাবনা তাঁর জীবন দর্শনকে গড়ে তুলেছিল আর সেই জীবন দর্শনেই আকার পেয়েছিল তাঁর গল্পে, সেখানে বাস্তব যতখানি আছে ততখানি আছে, তাঁর নিজস্ব আদর্শ আর অনুভব। বিদেশি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে গোর্কির সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেকেই। লেখক শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন –

> “নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী বলে অভিহিত করেছি। কথাটা হয়তো বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।”[২]

মন্বন্তর আর মুল্যবোধের ভাঙনকে দেখতে পাই তাঁর ‘পুষ্করা’, ‘দুঃশাসন’, ‘হাড়’, ‘কবর’ প্রভৃতি গল্পে। বস্ত্রসমস্যা আর খাদ্য সমস্যার সংকট ফুটে ওঠে দুঃশাসন, ইজ্জত গল্পে। দুর্ভিক্ষের দিনে নারীর ইজ্জত নিয়ে বেসাতির ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর ‘তীর্থযাত্রা’-র মতো গল্পে। সাম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলনের পটভূমি ছড়িয়ে আছে তাঁর ‘অপঘাত’, ‘কালনেমি’ গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছিলেন মধ্যবিত্তের নৈতিক অবক্ষয়, মানুষের স্বার্থপরতা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত্রতন্ত্র, চোরা কারবার, মজুতদারদের অমানবিকতা প্রভৃতি। এসবই তাঁর ছোটগল্পের উপাদান হয়ে উঠেছে। তিনি দেখেছেন ছেচল্লিশের দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ। দেখেছেন বাংলার ব্যবচ্ছেদ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘নক্রচরিত’ গল্পের নায়ক নিশিকান্ত নক্রবৎ। রাতের অন্ধকারে সে চোরাই গহনা সামাল দেয়। সে বিগত দিনে যৌবন, বৈষ্ণবকূল তিলক এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। তাঁর অর্থলোভ সীমাহীন। সে ডাকাতির সোনা কেনে কম টাকা দিয়ে, এবং যুদ্ধের বাজারে বেশি দামের আশায় আটশো নশো মন চালও মজুত করে রাখে। সে যেমন লোভী তেমনি ধুর্ত। তাঁর নেই কোন সৎ গুণ। গল্পে নিশিকান্ত চরিত্রটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন গল্পকার। বিগত যৌবন অথচ বিকারগ্রস্থ নিশিকান্তের মনে যৌন স্পৃহাও আছে। বিশাখার প্রতি তাঁর আকর্ষণ অপরিসীম। যেভাবে সে চাল ও বিশাখাকে মজুত করে রাখতে চায়, পাহারা দিতে চায় তাতে তাকে বিকলাঙ্গ শকুনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিশাখার প্রতি নজর দেয় ইব্রাহিম দারোগা। তবুও আইনের ও পুলিশের ভয়ে নিশিকান্তকে চুপ করে থাকতে হয়। গল্পটিতে শোষকের কদর্য রূপকে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেন গল্পকার। মতি পালের মৃত্যুতে যে বীভৎসতা আছে তাতে তৎকালীন মন্বন্তরের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নগ্ন সত্যকে দেখে চমকে উঠতে হয়। নিশিকান্ত, ইব্রাহিম দারোগা প্রভৃতি চরিত্ররা মনন্তরক্রান্ত গ্রাম বাংলার কালিমালিপ্ত শোষক চরিত্র।

‘নক্রচরিত’ গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা হলেও এ গল্প নিশিকান্ত চরিত্রটি পূর্ণ প্রস্ফূটন ঘটেনি। তাঁর মানসিকতা বিচলনের কোন পরিচয় গল্পে নেই। গ্রাম্য নিষ্ঠুর শোষক হিসেবে লেখক তাকে গল্প তুলে ধরেছেন কিন্তু চরিত্রটির এক বর্গীয়তার জন্য তাঁর ‘নক্রচরিত’ গল্পটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মর্যাদা লাভ করেনি। তবে “জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিভাগ চলে না” উক্তিটির মধ্য দিয়ে সার্থকভাবেই শোষক ও শাসিত সম্পর্কটি প্রকট হয়ে উঠেছে। গল্পের মধ্যে চরিত্র কেন্দ্রিকতা প্রাধান্য লাভ করেছে। নিশিকান্তের সামাজিক ক্ষমতা প্রশাসনকে বশে রাখার কৌশল কুটিল চিন্তা, নির্মম অমানবিকতা প্রভৃতি তাকে গল্পের প্রধান চরিত্র করে তুলেছে। গল্পের মধ্যে সে এক ভয়ংকর শোষক চরিত্র হিসাবে দেখা দিয়েছে।

যুদ্ধ ও মন্বন্তরের দিনগুলিতে মজুতদারী কীভাবে বেড়ে উঠেছিল তার সার্থক প্রমাণ হলো 'নক্রচরিত' গল্পটি। খাদ্য সংকটকে সৃষ্টি করেছে মজুদদার নিশিকান্তের মতো মানুষেরা। একদিকে ধর্মের ভণ্ডামি টাকার জন্য সর্বগ্রাসী কামনা, নারী লোলুপোতা ও অন্যদিকে দরিদ্রের সুখ, তাপ, মৃত্যু গল্পে তৎকালীন সমাজের দুর্দশা অবস্থা আর যন্ত্রণাকে স্পষ্টায়িত করেছে। নিশিকান্ত চরিত্রটি অমানবিক হয়ে উঠেছে ইব্রাহিম দারোগার শান্তিরক্ষক হয়েও স্বার্থরক্ষার জন্য অর্থলোলুপ ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

শোষকের অপরাধবোধকে এ গল্পে ব্যক্ত করেন লেখক। বস্তুতই শোষক নিজের নির্মম শোষণ সম্পর্কে অবগত থাকে। অবচেতন মনে এই অপরাধ ভার তাকে পীড়িত করে। অর্থপিশাচ, কপটহরি ভক্ত নিশিকান্তের হৃদয়েও আছে এক গোপন পাপবোধ। রাত্রিবেলা পথ চলতে তাই নিশিকান্ত ভয় পায়। তার মনে হয় পথের পাশের বাঁশঝাড় থেকে –

> "এখনই বেরিয়ে আসবে মাংস চর্মহীন অস্থিময় কতকগুলি ছায়া মূর্তি- তিলে তিলে যারা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে তাদের প্রেতদেহ।"[৩]

তার আরো মনে হয়- 'সেই মূর্তিগুলি আর্তনাদ করে উঠবে- আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভান্ডারে জমা করেছো তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু এখন?' বুভুক্ষ মানুষের মুখের ভাষা শুকিয়ে গেলেও তাদের চোখের বাসায় জ্বলে উঠেছে প্রতিবাদ, মৃত্যু পাণ্ডুর মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাদের অধিকারের দাবি। নিশিকান্তর মত চোরাকারবারির চাল পচে নষ্ট হয়ে গেলেও ক্ষুধার্তদের কথা ভাবে না। পচা চাল তারা ফেলে দেয় আর এক দানা চালের অভাবে মানুষ মারা যায় বন্য জন্তুর মতো। তাদের নির্মমতা ও পাষণ্ডতা শয়তানকেও হার মানায় ।

এই নারকীয় বীভৎস মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে শোষক নিশিকান্ত। দুর্ভিক্ষে এমন মৃত্যুর বর্ণনা আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাণের গুদাম' তারাশঙ্করের 'বোবাকান্না' প্রভৃতি গল্পে দেখতে পাই। খাদ্য সংকটের কারণে যে নির্মম মৃত্যু যজ্ঞ গ্রাম ও শহরের বুকে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল এঁদের সকলের গল্পেই তার অসাধারণ বর্ণনা আছে।

'হাড়' গল্পে খাদ্যসংকট, সামাজিক বৈষম্য ও মন্বন্তরের ফলকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের আর্থ সামাজিক পরিবেশ এই গল্পের পটভূমি। এ গল্পে রায়বাহাদুর ও তার কন্যা সুশী নব্য ধনতন্ত্রের প্রতীক। রায় বাহাদুর চ্যাটার্জির বালিগঞ্জের প্রাসাদ তম বাড়িতে কর্মপ্রার্থী হয়ে আসে এক যুবক। যুবকের অভিজ্ঞতাই গল্পের মূল অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। গল্পকথক উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছে যে কাহিনি যে কাহিনি সে কাহিনি থেকে সমাজের দুটি দিক পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে । একদিকে আছে অর্থগৌরব, বিলাস আর অন্যদিকে আছে নির্ধনের সুবিশাল বুভুক্ষা। অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তার শেষে যে বিশাল রাজ প্রসাদ, নীল পর্দার আড়ালে যেখানে খেলা করে ম্যাগ্নোলিয়ার মিঠে গন্ধ সেখানে বিলাসময় জীবন যাপন করেন রায়বাহাদুর। ইংরেজি কেতায় জীবন জীবনধারণে অভ্যস্ত রায় বাহাদুরের একটাই শখ এবং তা হল মানুষের হাড় সংগ্রহ করা। অথচ মন্বন্তর আক্রান্ত বাংলায় গল্পকথক দেখেছেন বেকারি, ক্ষুদা, দারিদ্র্য আর অনাহারে ভগ্নপ্রায় জীবন। রায়বাহাদুরের বিলাস, মানুষের হাড় সংগ্রহের নেশা, সবই যেন এর বিপরীত চিত্র। গল্পকথকের রায়বাহাদুরকে এক আশ্চর্য সুন্দর জাদুকর বলে মনে হয়। বহু অর্থব্যয়ে ওই হাড়গুলির অলৌকিক গুণ যেন সব সময় রায় বাহাদুরকে ঘিরে থাকে। চারিদিকের নিরক্ত ক্ষুধার্ত জীবনযাত্রা রায়বাহাদুরকে বিব্রত করে। চারপাশের ক্ষুধা ও মৃত্যুর আর্তনাদ রায়বাহাদুরের মনে কোন আলোড়ন তুলে না, বিশাল বাড়িতে রায়বাহাদুর তান্ত্রিকের শবসাধনার মতো জীবনে অতিবাহিত করেন তার 'হাড়' নিয়ে। দুর্ভিক্ষরত মানুষের জন্য রায়বাহাদুরের আছে শুধু ঘৃণা আর বিরক্তি। তিনি বলেন-

> "পার্কের ওই ডেসটিচুট গুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না...। খেতে না পেলে চিৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।"[৪]

গল্পের শেষে দেখি, গল্পকথক মনে করেন যে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হবার সময় এসেছে, কিন্তু তাদের মনে সে বিপ্লবের মন্ত্র তুলে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে সাধারণ মানুষকেই। বিপ্লবের মহান মন্ত্র সর্বহারা মানুষকে শ্রেনী চেতনায় উদ্দীপ্ত করবে।

মধ্যবিত্ত যুবকটি চাকরিপ্রার্থী হয়ে এসেছিল কিন্তু রায়বাহাদূরের কাছ থেকে সে কোন প্রত্যাশা বা অনুগ্রহ কিছুই লাভ করতে পারিনি। রায়বাহাদুর তাকে শুধু উপদেশই দিয়েছে। 'হাড়' গল্পের সমগ্র ঘটনা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি বেকার ছেলের চাকরির আশায় দিনহীনের মতো উচ্চবিত্ত পিতৃ-বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাওয়া, অলৌকিক শক্তিধর হওয়ার নেশায় নেশাগ্রস্ত সেই ভদ্রলোকের হাড়ের সংগ্রহ দর্শন ও বাইরের নিরন্ন মানুষের শুকনো হাড় চোষার চিত্রের মধ্যে দিয়ে জঙ্গি বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতি লেখকের তীব্র ধিক্কার ঘোষিত হয়েছে। এ হলো মন্বন্তরক্রান্ত কলকাতার বাস্তব রূপ। এ বর্ণনায় এক বিন্দু নাটকীয়তা নেই, বরং আছে জীবন্ত, রুক্ষবাস্তব। লেখকের মনে বিপ্লবের স্বপ্ন ঘনায় , তিনি কল্পনা করেন,

> "হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি।"[৫]

দুর্ভিক্ষের দিনে মহামারী ও খাদ্যহীনতার সংকটকে তুলে ধরলেন লেখক তার 'পুষ্করা' গল্পে। মানুষের সংস্কার, ক্ষুধার তাড়না আর মৃত্যুর হাতছানি একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে এ গল্পে। দুর্ভিক্ষের দিনে গ্রামের মানুষকে দেবীর কোপ আর কলেরার হাত থেকে রক্ষা করতে তর্করত্ন শ্মশান কালীর পুজোয় বসেছেন শুক্লা চতুর্দশীতে। এই পুজোর পরিবেশ ভয়ংকর।

এ গল্পে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম জুড়ে মৃত্যু দেবীর পদধ্বনি। চারিদিকে পূজাস্থলের মতোই শ্মশানের শান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। তারি মাঝখানে তর্করত্নের দেবীকে প্রদত্ত শিবাভোগ প্রায় ব্যর্থতার পর্যবসিত হতে বসেছে। তিনি শাস্ত্রের বিধান জানেন। জানেন শিবাভোগের আয়োজন নিস্ফল হলে গ্রামে অনাবৃষ্টি ও অবধারিত পুষ্করা লাগবে। সমস্ত কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ রাতে তর্করত্ন ভাববিভোর চোখে দেখলেন শৃগাল রূপে নয় বরং মানবী রুপে স্বয়ং দেবী এসে শিবাভোগ গ্রহণ করেছেন। এই অলৌকিক, অভূতপূর্ব ঘটনার তার নামে জয়জয়কার পড়ে গেছে। তর্করত্নের প্রণামী ৩০০ টাকা থেকে লাফিয়ে ৫০০ টাকা হয়ে গেছে আর ভোজ্যবস্তুতে ভরে উঠেছে তার গাড়ির অর্ধেক । লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রে প্রশান্তচিত্তে তর্করত্ন নিজের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, যখন তিনি দেশ ও দশের উজ্জ্বল সোনালী স্বপ্ন দেখেছেন তখনই পথের পাশে পড়ে থাকা পাগলী ডোমনীর মুমূর্ষ শরীরটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তিনি জানতেন না যে ডোম পাড়ার ওই পাগলীটাই গতরাত্রে ক্ষুধার জ্বালায় শিবাভোগ গ্রহণ করেছিল । দীর্ঘকাল অনাহারের পর অপরিমিত ভোগ তার ক্ষুধানিভৃতি ঘটাতে পারেনি। আর তাই সে ভেদ-বমিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মারী ও মড়কের বলি হয় ডোমপাড়া পাগলির মত সাধারণ দরিদ্র মানুষেরাই । তর্করত্ন চিরকালই শোষকের ভূমিকায় থেকে যায়। জীবনের সবকিছু সুখ, শান্তি আর পরিতৃপ্তির সুযোগ শুধু ওদেরই প্রাপ্য। ডোম পাড়ার পাগলিদের জন্য আছে মন্বন্তরের নিদারুণ যন্ত্রণা আর মৃত্যু। সংস্কারান্ধ তর্করত্নকে উদ্ধার করেছে ডোম পাড়ার ওই পাগলীটাই। রক্ষা করেছে তার সম্মান ও খ্যাতি। কিন্তু নিজেকে সে রক্ষা করতে পারেনি, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে।

'পুষ্করা' গল্পে একদিকে যেমন বিত্তভোগী মানুষের অন্ধ দেবভক্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন লেখক, অন্যদিকে তেমনি যুদ্ধের সময়ে খাদ্যহীনতার চরম সংস্কারকেও তুলে ধরেছেন। ধর্মের নামে পুরোহিততন্ত্রের ভন্ডামিকে তুলে ধরেছেন তিনি। গল্পে তর্করত্নের স্বপ্নময় কল্পনার বিপরীতে কঠোর বাস্তবকে তুলে ধরে

লেখক মন্বন্তরে প্রচন্ডতাকে বুঝাতে সার্থক হয়েছেন। মন্বন্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহামারীও যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল তার প্রমাণ পাই 'পুষ্করা' গল্পটিতে। লেখকের ভাষায়-

> "আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু। ছয়মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো দিব্যি আছে কোন রোগ ব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের মত ধরফর করে মরে যাচ্ছে।"[৬]

দেশের দুর্ভিক্ষ, মোড়ক থেকে মানুষকে বাঁচাবার কামনাতেই অন্ধ সংস্কার বসে শ্মশান কালীর পুজো করা হয়েছিল। কিন্তু ডোমপাড়ার ঐ হতভাগিনী দেবীর ভোগ লাভ করেও মৃত্যুর হাত থেকে নিজের জীবনকে বাঁচাতে পারেনি। পেটের জ্বালায় সে দেবতার খাদ্যকে ছিনিয়ে নিয়ে খেয়েছিল কিন্তু তবু মৃত্যুর হাত থেকে সে নিজেকে এড়াতে পারেনি। বরং বাঁচার নিধারুণ প্রচেষ্টায় শেষ সময়ে কালীর মত জিভ মেলে সে হাঁপাছিল এক ফোটা জলের আশায়। তর্করত্নে শ্মশান কালী আসলে পাগলিনী সেই ডোম গৃহবধূ যে আকালের দিনে হারিয়েছিল তার স্বামী আর তিন ছেলেকে। মৃত্যুর আশা দিনগুন ছিল সে, আর পথের ধুলায় ছটপট করে প্রানত্যাগ করেছিল। 'দেবভোগ্য' সে সহ্য করতে পারেনি। লেখক গল্পের উপসংহারে বলেন...

> "কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে । মারী ও মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মত নিঃশ্বাসে পান করে নেয়"[৭]

রবীন্দ্রনাথও ছিলেন পুরোহিততন্ত্রের অসারতা ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে। তার 'কালের যাত্রা' নাটকে পুরোহিততন্ত্রের প্রতি বিরোধিতা আছে। উচ্চবর্ণ ও বণিক সম্প্রদায়ের মদতপুষ্ট পুরোহিতরা ধর্মতন্ত্র কেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজেরই সৃষ্টি। এরা অশিক্ষিত মানুষের দৈব বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিপ্লব চেতনাকে জাগতে দেয় না। অভিভূত ও অলস করে রাখে। এদের অশিক্ষা ও ভয়কে সুকৌশলে কাজে লাগাতে চায় তারা। উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি। স্বামী-পুত্র হারা ডোম বধুর মৃত্যু 'পুষ্করা' গল্পে তারই বিষময় ফল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দিনকে অবলম্বন করে বস্ত্র সংকটের উপরে যে কয়টি গল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গল্পটি হল 'দুঃশাসন'। এই নাম গল্পটি সংকলন গ্রন্থের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। ঐ একই বিষয়ের উপর লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যেতে পারে। মহাভারতের দুঃশাসন চরিত্রটি যে নির্লজ্জ পাশবিকতা খুঁজে পাই তাকেই এখানে বস্ত্র সনংকটাকীর্ণ গ্রাম বাংলার বুকে প্রতীক অর্ধে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংকট তীব্র ও নির্মম হয়ে বাংলার বুকে দেখা দিয়েছিল। এটি তারই কাহিনি। বাংলার বস্ত্রসংকটকে লেখক দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্রহরণের সাথে এ গল্প তুলনা করছেন।

দেবীদাস কাপড়ের আড়তদার। কিন্তু যুদ্ধের সময় মানুষের প্রয়োজন আর নিরব চোখের জল দেখে ও সে একখন্ড কাপড় দেয় না। ভাইপো গৌর দাসের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় যে দান ধর্ম করলে ব্যবসার ক্ষতি হবে। থানায় আয়োজিত যাত্রা পালায় কিন্তু দেবীদাস ৫০ টাকা চাঁদা দেয়। এই যাত্রার নাম 'দুঃশাসনের রক্তপান'। যাত্রার পরে সকালের আলোয় এক ষোড়শীকে নগ্ন অবস্থায় জল আনতে দেখে দেবিদাস ও গৌর দাস। যাত্রার ভীম মহাভারতের রীতি মেনে দুঃশাসনকে হত্যা করে রক্ত পান করেছিল কেন না, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বস্ত্রহরণ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু 'এ যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে' বস্ত্রহরণ করলেই তার কোন শাস্তি নেই। আসলে সে কালে যেমন দুঃশাসন ছিল তেমনি ভীমেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু এ কালে শুধু দুঃশাসনেরাই আছে। তাই তাদের জয় সর্বত্র।

তবু কি মানুষের প্রতিবাদে দিন শেষ হয়ে গেছে? যাত্রার মরা গ্যাসের আলোয় গৌর দাস দেখে কঙ্কালসার মানুষের দল। তাদের হাতের হেঁসোগুলো দেখে দেবী দাসের মনে হয় "অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?" ওরাই যেন আগতকালের ভীম যারা দুঃশাসনদের পরাজিত করবে। এ গল্পে গৌর দাস নিজেদের শোষক বলে উপলব্ধি করেছে। নিজেদেরকেই দুঃশাসন বলে মনে হয়েছে তার। গল্পের দেবীদাস বস্ত্র ব্যবসায়ী শুধু নয়, বস্ত্রের মজুতদার ও কালোবাজারীও বটে। মন্বন্তরাক্রান্ত বাংলার বুকে সে জীবন্ত দুঃশাসন। নির্লজ্জ পাশব হাতে যুগের বস্ত্রহরণ করে চলেছে সে । মানুষের সমস্ত লজ্জা আর মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে সে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে। দারোগা পুলিশের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সুহৃদয় সম্পর্ক। প্রশাসনের সঙ্গে তার অশুভ আঁতাত। মন্বন্তরের সময় প্রশাসন ব্যবস্থা যে ধ্বংস হয়ে প্রহসনে পরিণত হয়েছিল এ সত্যটুকু ও লেখক আঙ্গুল দিয়ে গল্পে দেখিয়ে দেন। গল্পের শেষের লেখকের ব্যাখ্যায় ফুটে উঠে অপরাধপ্রবণ দেবীদাসের ভাবনা।

এ গল্পের ভিখারির উক্তিতে মন্বন্তরক্রান্ত বাংলার বুকে বিবেকহীন কিছু মানুষের পরিচয় ভেসে উঠে, ধরা পড়ে স্বর্ণকুলীন সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য বাস্তব রূপটি। যে সমাজ তার আশ্রিত মানুষদের বিপদের দিনে রক্ষা করতে পারেনা তাদের বিচারের অধিকারও নেই সেই সমাজেরমাজের। এ ভাবনা আমরা বহু পূর্বের শরৎচন্দ্রের সমাজ ভাবনাতেও পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সমাজে যুগভাবনা ছিল আলাদা। সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানিকের অনেক কাছাকাছি। নিজের দায় ও দায়িত্বকে তিনি এড়িয়ে যাননি বরং পুঙ্খনুপুঙ্খ ভাবে সমাজ সমলোচনা করেছেন। সামাজিক অনুশাসন, সতীত্ব সংস্কার, ন্যায় নীতি ইত্যাদি পূর্ণ বিচারে দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী বলেছিলেন-

> "বাংলার বুকে একদিন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল সে কথা ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। কি কারনে এই প্রলয় ঘটেছিল তারও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই বর্ণনায় ভবিষ্যতের লোকের কাছে আজকের এই প্রলয়চিত্র কখনও জীবন্ত হয়ে উঠবে না, উঠবে এই গল্পগুলোর মধ্য দিয়েই।"[৮]

চল্লিশের দশক অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় ও মন্বন্তর পর্বের গল্পগুলি হলো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর গল্পে রাজনীতি আছে কারণ রাজনৈতিক চেতনা চল্লিশএর দশকের লেখকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভাষাকে স্পষ্ট করেছিলেন। পরবর্তীতেও শোষকের বিরুদ্ধে ঘৃণা, রোষ, জমিদার-জোতদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে আমরা ছোটগল্পে খুঁজে পাই। মন্বন্তর আর যুগের অবক্ষয় নিয়েও গল্প লিখেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তী গল্পকারেরা। তাঁর গল্পের আঞ্চলিক ভাবনা ও সাধারণ জীবন-কেন্দ্রিক গল্প রচনা উত্তর কালের লেখকদের উৎসাহিত করেছে। সাহিত্য সেরা বিচারক হলেন পাঠক। পাঠকের দরবারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, চিরকাল পাঠকের ভালোবাসা পেয়ে এসেছেন চিরকাল পাবেন।

## তথ্যসূত্র:

**১.** গঙ্গোপাধ্যায় ড. অভিজিৎ, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের রূপকার', পৃ-৯০
**২.** তদেব, পৃ-৯২
**৩.** তদেব, পৃ-৯৫
**৪.** তদেব, পৃ-৯৫
**৫.** তদেব, পৃ-১৫০
**৬.** তদেব, পৃ-১৫২

৭. তদেব, পৃ-১৫৪
৮. তদেব, পৃ-১৫৬

**আকর গ্রন্থ**

১. ভট্টাচার্য অধ্যাপক জগদীশ সম্পাদনা, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম সংস্করণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬১।
২. গঙ্গোপাধ্যায় ড. অভিজিৎ সম্পাদনা, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: ছোটগল্পের রূপকার', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২রা এপ্রিল ২০১৫।